আলী তানতাভী

শিশু-কিশোর সিরিজ

গল্পে আঁকা ইতিহাস-৬

আঙ্গুর ও মন্দীর

ইয়াহইয়া ইউসুফ নদভী

অনূদিত

শিশু-কিশোর সিরিজ

গল্পে আঁকা ইতিহাস-৬

আলী তানতাভী

আঙুর ও মন্ত্রীত্ব

অনুবাদ

ইয়াহইয়া ইউসুফ নদভী

ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলা বাজার, ঢাকা

শিশু-কিশোর সিরিজ
গল্পে আঁকা ইতিহাস-৬

লেখক : আলী তানতাভী
অনুবাদক : ইয়াহইয়া ইউসুফ নদভী

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী ২০০৮ ঈ.

কিতাব কানন, দোকান নং- ৪০ (দোতালা), ১১ বাংলা বাজার ঢাকা থেকে প্রকাশিত এবং এশিয়াটিক সিভিল মিলিটারি প্রেস স্বামীবাগ ঢাকা থেকে মুদ্রিত।

প্রচ্ছদ
বশির মেসবাহ

মূল্যঃ
৫০.০০ টাকা মাত্র

Shishu Koshur Series: Golpe Anaka Etihash- { History in drawn Story} by Ali Tantawi, Translated by Yahya Yusuf Nadwi, Published by : Kitab Kanan, Islami Towar, 11 Bangla Bazar, Dhaka. Price : $ 3 only £ : 2 only

শিশু-কিশোর সিরিজ

গল্পে আঁকা ইতিহাস-৬

আঙুর ও মন্ত্রীত্ব

আঙুর এবং মন্ত্রীত্ব

এক ঐতিহাসিকের ভাষায়

আমি ৫০৬ হিজরীতে বাগদাদ এসেছিলাম। তখন খলীফা মুস্তাঞ্জিদের শাসনকাল চলছিলো। আমি চোখভরে বাগদাদ দেখছিলাম। সারা বাগদাদে ভ্রমণ-বিলাসীর মতো ঘুরছিলাম। অবলোকন করছিলাম বাগদাদের দৃষ্টিনন্দন প্রাসাদ, আকাশচুম্বী অট্টালিকা, চোখ-জোড়ানো উদ্যান এবং অন্যান্য বহুমুখী উন্নয়ন প্রকল্প।

একদিন ঘুরতে ঘুরতে চলে এলাম একটা প্রাসাদের সামনে। প্রবেশদ্বারের ভিতরে-বাইরে দাঁড়িয়েছিলো সশস্ত্র সৈন্যরা। ভাবলাম, নিশ্চয়ই কোনো আমীর-উমারার বাসভবন হবে। তবু কৌতূহল মেটাতে একটু এগিয়ে গেলাম। জানতে চাইলাম–
'এটা কার প্রাসাদ?'
'মন্ত্রীর প্রাসাদ।' সৈন্যদের নির্লিপ্ত উত্তর।

প্রাসাদের পাশেই শোভা পাচ্ছিলো কারুকার্যমণ্ডিত একটি মসজিদ। আলেম-উলামা ও মুহাদ্দিসগণের পোষাকে একদল মানুষ ধীর ও শান্ত পায়ে মসজিদে প্রবেশ করছিলো। কী এক আকর্ষণে আমিও তাদের সাথে মিশে গেলাম। প্রবেশ করলাম মসজিদে।

মসজিদ ছিলো লোকে লোকারণ্য। সবাই বসেছে গোল হয়ে। বুঝতে আমার কোনো অসুবিধে হলো না যে, আমি এক ইলমী হালকায় (জ্ঞানের আসরে) এসে বসেছি। এখানে আমার না বসারই কথা ছিলো। তবুও কী এক আকর্ষণে বসেই থাকলাম, উঠতে পারলাম না। একটু পর শুরু হলো দরস। প্রথমে সবাই হাদীস পড়লো। তারপর ফিক্হ। তারপর আরবী ভাষা ও সাহিত্য। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো– বিষয় বদল হলেও শিক্ষক বদল হলেন না! সব বিষয়েই পাঠ দিচ্ছিলেন একজনই। তিনি বসা ছিলেন মিম্বরে। কী আলো-ছড়ানো চেহারা! দেখলেই শ্রদ্ধায় মন ভরে উঠে।

তাঁর আলোচনা শুনে মনে হচ্ছিলো– তিনি হাদীস-ফিক্হ-আরবী– সব বিষয়েই সমান পারদর্শী। তাঁর উচ্চারণ ও বাচনভঙ্গি ছিলো স্পষ্ট, যুক্তিসমৃদ্ধ ও শ্রুতিমধুর। মাগরিব থেকে ইশা পর্যন্ত মজলিসের দৃশ্যপট একটুও বদলালো না। আযানের পর আস্তে আস্তে মজলিস ভেঙে গেলো। কেউ গেলো অজু করতে। কেউ দাঁড়িয়ে গেলো সুন্নত পড়তে।
আমি পাশের একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম–
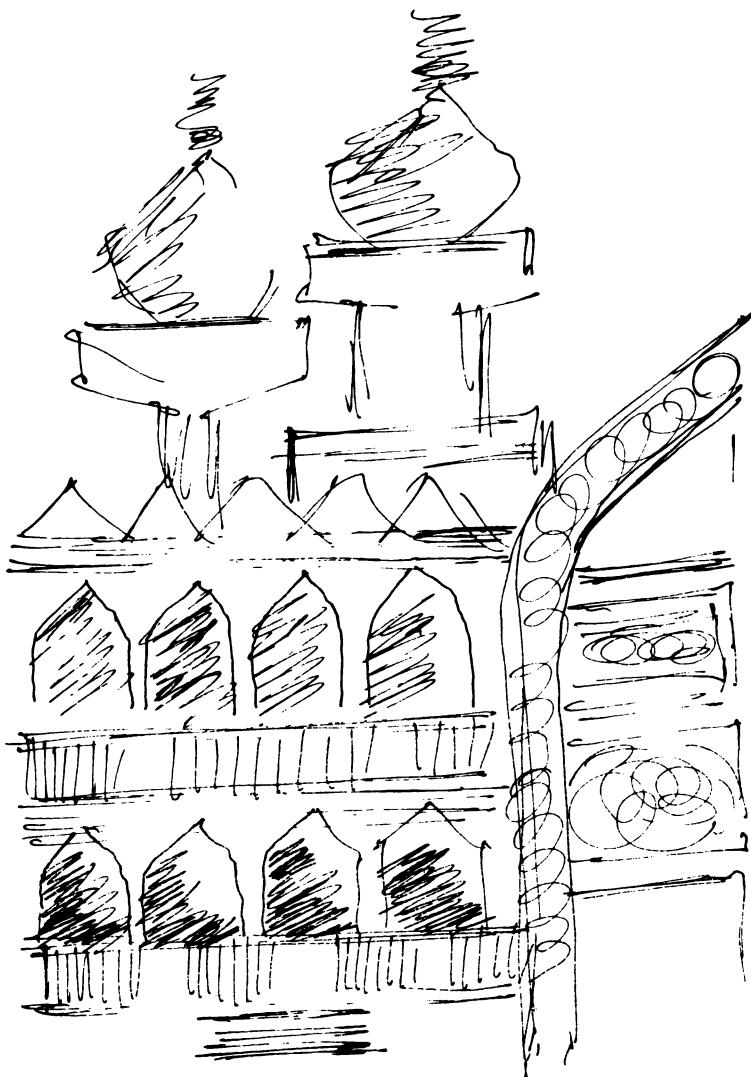
‘একটু আগে যিনি প্রতিটি বিষয়ে দক্ষতার সাথে পাঠ দান করছিলেন– তাঁর পরিচয়?’
পাশের লোকটি আমার কথায় বিস্ময় ঝরিয়ে বললো–
‘আশ্চর্য! তুমি তাঁকে চেনো না?! তিনি সম্মানিত মন্ত্রী ইয়াহইয়া ইবনে হোবায়রা। তাঁর আলোচনা আগে শোনো নি?’
আমি বললাম–

‘হ্যাঁ শুনেছি। কিন্তু মন্ত্রী পরিষদের সেই সদস্য যে মসজিদের এই

মিম্বরে বসে কথা বলবেন শ্রেষ্ঠ আলেম, ফকীহ ও মুহাদ্দিসের ভাষায়– সে তো আমার জানা ছিলো না!’

লোকটি তখন বললো–
‘তাঁর আসল পরিচয় হলো, তিনি একজন আলেম। মন্ত্রী হয়েছেন তো বেশ পরে। বাগদাদে প্রথম এসেছিলেন তিনি তালিবে ইলম হয়ে মন্ত্রীত্ব লাভ করেছেন তার বেশ পরে। মন্ত্রীত্ব কীভাবে তিনি লাভ করেছিলেন– সে এক মজার কাহিনী। সে কাহিনী’র স্বাদ ও মজা– রূপকথাকেও হার মানায়!’
আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম–
‘বলেন কী! তাহলে তো শুনতে হয়!’
তখন কে যেনো পেছন থেকে বলে উঠলো–
‘শুনতে চাইলে শুনবে! এক থোকা আঙুরের বিনিময়ে তিনি মন্ত্রীত্ব লাভ করেছিলেন!’

আমি পেছনে ফিরে তাকালাম। দেখলাম, আর কেউ নন, স্বয়ং মন্ত্রী দাঁড়িয়ে আছেন আমার পেছনে! মুখে এক টুকরো মিষ্টি হাসি! তিনি অজু করতে যাচ্ছিলেন। আমাদের আলোচনা কানে যেতেই তিনি এগিয়ে এলেন। কতো বড় মানুষ, অথচ কতো সহজ ও সাদাসিধে তার ‘জন-মেশা’। আমি লজ্জা-জড়িত ভঙ্গিতে এক পাশে সরে দাঁড়ালাম। তিনি আমার জড়তা দূর করতে বললেন–

‘লজ্জার কিছু নেই! নামাযের পর আমাকে মনে করিয়ে দেবে। আমি নিজেই তোমাকে শোনাবো সে কাহিনী।

নামায শেষে আবার মজলিস বসলো। মজলিস শেষে দেখলাম, মন্ত্রী চলে যাচ্ছেন! তাঁর মন্ত্রীত্ব লাভের মজার কাহিনীটা কি তাহলে আমার শোনা হবে না? আমি ব্যাকুলচিত্তে তাঁর কাছে ছুটে এসে বললাম–
‘বলেছিলেন আপনাকে মনে করিয়ে দিতে!’

মন্ত্রী তখন আমার দিকে সস্নেহ দৃষ্টিতে তাকালেন এবং বললেন– 'এসো তাহলে তোমাকে শোনাই সে কাহিনী!'

কাহিনী শুরু হওয়ার আগেই আমি বুঝতে পারছিলাম– এ কাহিনী কোনো সাধারণ কাহিনীর মতো হবে না। এক অপরিচিত ভিনদেশীকে মুহূর্তেই যিনি একান্ত আপন করে নিতে পারেন এবং নিজের জীবনের শ্রেষ্ঠ কাহিনীর কৌতূহলী শ্রোতা বানিয়ে ফেলতে পারেন– তাঁর কাহিনী যে 'যেই-সেই' কাহিনী নয়– তা অনুভব করতে আমার একটুও কষ্ট হলো না!

আমি তন্ময়চিত্তে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে শুনতে লাগলাম– তাঁর কাহিনী! শুনতে শুনতে আমার মনে হচ্ছিলো, সুন্দর সুন্দর কথা ও ভঙ্গিতে তিনি যেনো চমৎকার একটা মালা গেঁথে চলেছেন! তাঁর কাহিনীর একটা একটা বাক্য শেষ হচ্ছে আর সে মালায় যেনো একটি একটি করে ফুল গাঁথা হচ্ছে! আমি মনে মনে চাইছিলাম, তাঁর কাহিনীটা অনেক অনেক দীর্ঘ হোক, তাহলে মালাটাও অনেক বড় হবে! তিনি সূচনা করলেন এভাবে–

'আমি বাগদাদ এসেছিলাম আসলে ইলম হাসিলের দুর্বার পিপাসা নিয়ে। ক্ষমতা ও পদ লাভের কোনো চিন্তা-ই আমার মাথায় ছিলো না। ইলম শিখে তার উপর আমল করবো, অন্যকেও শেখাবো এবং তার উপর আমলের দাওয়াত দেবো, সবার মাঝে ইলমের নূর ছড়িয়ে দেবো– এই ছিলো আমার একমাত্র লক্ষ্য, একমাত্র ব্রত। একমাত্র সাধনা। একমাত্র স্বপ্ন।

বেশ নিমগ্নতার সাথেই আমি পড়াশুনা করে যাচ্ছিলাম। সকালে কিতাব নিয়ে ছুটে যেতাম মুহতারাম মুহাদ্দিসগণের কাছে। ডুবে যেতাম হাদীস পড়ায়। তারপর ছুটে যেতাম ফিক্‌হবিদদের কাছে।

ডুবে যেতাম ফিক্‌হের গভীরে। সবশেষে ছুটে যেতাম ব্যাকরণবিদ, হাদীস বর্ণনাকারী আরবী ভাষাবিদগণের মজলিসে। পিপাসা মেটাতাম, আমার দুর্বার পিপাসা। এভাবে প্রতিটি বিষয়েই চলতে লাগলো আমার 'জ্ঞান-আহরণ-সাধনা'। কিন্তু কোনো বিষয়েই দক্ষতা অর্জন সম্ভব হলো না। হওয়ার কথাও ছিলো না। কেননা, একসঙ্গে সমানতালে অনেক বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করলে সব বিষয়ে বিশেষ দক্ষতা অর্জন সম্ভব না। সুতরাং এবার আমি বিশেষ দক্ষতা অর্জনের জন্যে মনোযোগ দিলাম হাদীস এবং আরবী ভাষা ও সাহিত্যের উপর।

শুরু হলো গভীর পড়াশোনা ও গবেষণা এবং সীমাহীন অধ্যাবসায় ও সাধনা। কিন্তু হঠাৎ ছেদ পড়লো এই ধারায়। এলো বাধা। আমি বাড়ি ছাড়ার সময় যে অর্থকড়ি সাথে নিয়ে এসেছিলাম, ইতিমধ্যে তার প্রায় সবটাই শেষ হয়ে গেছে। অথচ ইলমী সফর জারি রাখার জন্যে আমার আরো সময় ব্যয় করতে হবে, আরো সম্পদ খরচ করতে হবে।

আমি বেশ চিন্তায় পড়ে গেলাম। এদিকে দ্বীন বিক্রি করে দুনিয়া তালাশ করা অর্থাৎ কাউকে ইলম শিখিয়ে তার বিনিময় গ্রহণ করা– এ ছিলো আমার ভীষণ অপছন্দ। তাই ইলম হাসিল করার মহান ধারাবাহিকতা বজায় রাখার তাগিদে আমি বাধ্য হলাম একটা 'চাকরি' খোঁজতে। আর এ জন্যে হন্যে হয়ে ছুটে বেড়াতে লাগলাম– এই কার্যালয় থেকে সেই কার্যালয়ে, এই কারখানা থেকে সেই কারখানায় এবং এই ভবন থেকে সেই ভবনে। কিন্তু সবখানেই শুনতে হলো– 'না'। অর্থাৎ কোথাও কোনো কর্ম খালি নেই। এদিকে আমার টাকার-থলেটা অনেক আগেই ফাঁকা হয়ে গেছে। না

খেয়ে আছি দু'দিন। কারো কাছে হাত পেতে অভ্যাস নেই। তাই প্রয়োজন সত্ত্বেও হাত পাততে পারলাম না। মুহতারাম শিক্ষকদেরকেও আমার বর্তমান অবস্থা বুঝতে দিচ্ছিলাম না। মুখের দৈন্যতা ও দুঃশ্চিন্তা ঢেকে রাখতাম– ইলম হাসিলের আগ্রহের ছায়া দিয়ে। তাঁদের সামনে আমার ক্লান্ত-শ্রান্ত-অভুক্ত চেহারাটা লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করতাম– ইলম হাসিলের ব্যাকুলতা দিয়ে।
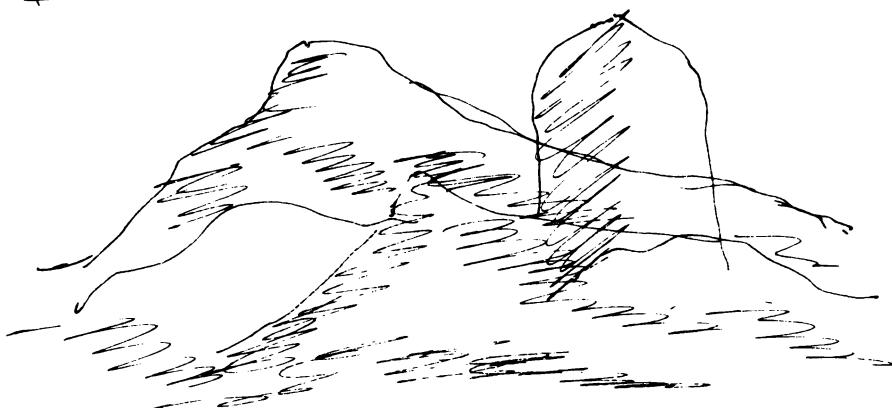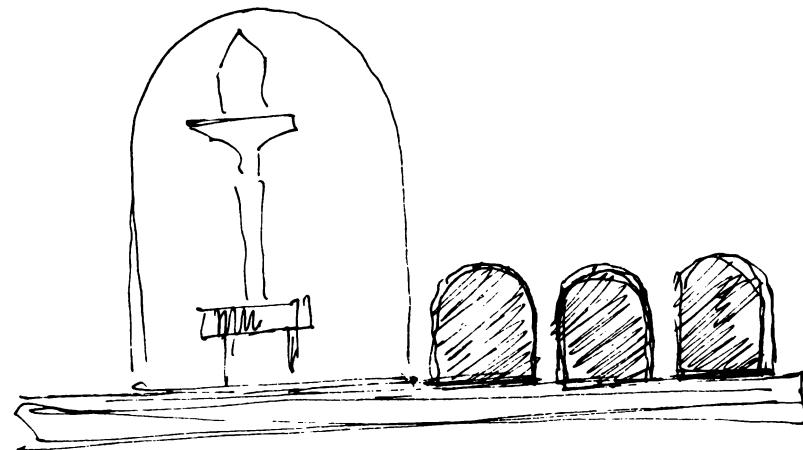
এভাবে বাগদাদের পথে পথে আমি ঘুরছিলাম– একটা চাকরির খোঁজে। কখনো হাঁটতাম উদ্দেশ্যহীনভাবে। তখন চোখে পড়তো, চারপাশের মানুষ পথ চলছে কী নিশ্চিন্তে। সবাই কী হাসি-খুশি। কতো মানুষ সওয়ারীতে বসে আছে। কেউ আসছে, কেউ যাচ্ছে। কারো মুখেই ক্ষুধা ও অভাবের কোনো চিহ্ন নেই। সবার চেহারায় ঝলমল করছে একটা সুখী-সুখী ভাব। ক্ষুধা-তৃষ্ণা-দারিদ্র যেনো একা আমার কাঁধেই এসে সওয়ার হয়েছে। আমার মনে হতো– ওরা সবাই যেনো 'সুখ-গ্রহের' মানুষ। আমিই ওদের মাঝে একমাত্র 'দুঃখ-গ্রহের' মানুষ।

মরুর বুকে ঝরনাধারা

একদিন ঘুরতে ঘুরতে চলে এলাম এক মরু অঞ্চলে। লোকালয় থেকে বেশ খানিকটা দূরে। তখন পেটে চলছিলো বেসামাল ক্ষুধার স্লোগানমুখর মিছিল। ঠিকমতো দাঁড়াতেই পারছিলাম না। একটু বিশ্রামের বড়ো সাধ হলো। কিন্তু এই মরুতে কোথায় গিয়ে দু' দণ্ড বিশ্রাম নিই? হঠাৎ চোখ পড়লো দূরের একটা মসজিদে। কাছে গিয়ে দেখলাম– বিরান অনাবাদ মসজিদ। আমার ক্ষুধার্থ মনটাকে বললাম– 'চলো এখানেই একটু বিশ্রাম নেয়া যাক। তারপর দু'রাকাত নামায পড়ে সাহায্য চাও– মানুষের কাছে নয়, আল্লাহ্‌র

কাছে!’
নামায পড়ে আমি দু‘আ করলাম। আমার ক্লান্ত অবসন্ন ও ক্ষুধা-কাতর মনের সবটুকু দুঃখ ও বেদনা শুধু তাঁর কাছেই পেশ করলাম। কেঁদে-কেঁদে তাঁর কাছেই জানালাম আমার ভাঙা হৃদয়ের অশ্রুময় আকুতি।

বুকটা একটু হালকা হলো। দুঃখবোধটা একটু কমে এলো। একাকীত্ব ও শূন্যতাবোধটাও দূর হয়ে গেলো। মনে বড়ো প্রশান্তি অনুভব করলাম। আল্লাহকে ডাকার জন্যেও পরিবেশ লাগে। সবার সামনে বসে নিজেকে আল্লাহ্‌র সামনে পরিপূর্ণরূপে পেশ করা যায় না। সংকোচ লাগে। কেউ কেউ আবার ভাবতে পারে– 'দেখ্ লোকটার বুযুর্গী দেখ!' কেউ আবার বলতে পারে– 'ঐ দেখ কেমন বুযুর্গ সেজেছে! লোক দেখাচ্ছে!'

আসলে খাঁটি নিয়তে আল্লাহ্‌র কাছে চাইলে আল্লাহ তাঁর বান্দাকে ফিরিয়ে দেন না। আল্লাহ চান– যেনো আমরা তাঁর কাছে চাই, হাত পাতি। কিন্তু আমরা চাই না, হাত পাতি না। দু'আর অস্ত্র ব্যবহার করি না। দু'আর অস্ত্র যে সবচে' বেশি শক্তিশালী অস্ত্র, তা বিশ্বাস করতে আমাদের কষ্ট হয়। যারা আল্লাহ্‌র প্রতি পূর্ণ ঈমান ও গভীর বিশ্বাস নিয়ে দু'আ করে, আল্লাহ তাদেরকে দেবেনই। যা চাওয়া হবে, তা-ই দেবেন। অথবা দেবেন তারচে' ভালো কোনো জিনিস। আল্লাহ কেনো দেবেন না? তিনি তো দিতেই ভালোবাসেন! আমরা শুধু নিতে জানি না, চাইতে জানি না!

দু'আ শেষ করে আমি বেরিয়ে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ মসজিদের এক কোণে শুয়ে থাকা এক বৃদ্ধের উপর আমার চোখ পড়লো। কাছে গিয়ে দেখলাম– ধূলো-মলিন একটা চাটাইয়ে শুয়ে আছেন অসুস্থ বৃদ্ধটি। ভীষণ মায়া হলো আমার! চেহারা হলদে। চোখ ধূসর, কোঠরাগত। গাল ভেঙে গর্ত হয়ে গেছে। ঠোঁট দু'টি শুস্ক। কতোদিন এভাবে পড়ে আছে– কে জানে! তার ভিতর থেকে ভেসে আসছে একটা অস্ফুট গোঙানির শব্দ। একদম মরে মরে অবস্থা। আমি আরো কাছে গেলাম। কিন্তু অসহনীয় দুর্গন্ধে আবার পিছিয়ে

এলাম। আমার মন বললো (বরং শয়তানই আমাকে এমন করে বলতে প্ররোচিত করেছে)–

'শুনি; তাকে নিয়ে এখন মাথা ঘামানোর দরকারটা কী তোমার? যাও! এর চিন্তা বাদ দিয়ে নিজের চিন্তা করো। এ তো এখন মৃত্যুর সাথে লড়ছে। একে বাঁচানো যাবে না। এর জন্যে তোমার কিছুই করার নেই। তা ছাড়া কিছু করার ক্ষমতাই বা তোমার কোথায়? নিজেই তো খেতে পাওনা আজ দু'দিন হয়ে গেলো!'

কিন্তু এ-চিন্তাকে আমি আমল দিলাম না। একজন মানুষ হিসাবে সর্বোপরি এক মুসলমান হিসাবে ভাবলাম–

'এক মুসলমান কি আরেক মুসলমানকে এমন অবস্থায় রেখে চলে যেতে পারে? তার প্রতি আমার কি কোনো করণীয় নেই? এ–অবস্থায় চলে যাওয়াটা কি চরম অমানবিকতা নয়? মানবতার লাজ রক্ষা করা কি আমার দায়িত্ব নয়?'

আমি বৃদ্ধের প্রতি ভীষণ টান অনুভব করলাম। তার কাছে গিয়ে বসলাম। বললাম–

'আপনি কে? এখানে কেনো এভাবে পড়ে আছেন?'

বৃদ্ধ চোখ খুললেন। চোখ দু'টি আশ্‌পাশে ঘুরাতে লাগলেন। যেনো তিনি কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না। একটু পর আবার তা বন্ধ হয়ে গেলো। আবার বৃদ্ধ গোঙাতে লাগলেন। যেনো মৃত্যুর কাতর যন্ত্রণায়। আমি আবার তার কাছে জানতে চাইলাম–

'কী প্রয়োজন অপনার? কতোদিন ধরে আপনি অসুস্থ?'

বৃদ্ধ আবার চোখ খুললেন। দৃষ্টি তার স্থির হয়ে রইলো। আমাকে গভীর করে দেখে নিয়ে ক্ষীণ কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন–

'আমি আঙুর খাবো!'

‘আঙুর!’ আমি চমকে উঠলাম। তার মুখ থেকে আঙুর ছাড়া আর সবকিছুই যে আমি আশা করছিলাম! কোত্থেকে আমি তাকে আঙুর এনে দেবো? আমি তো লোকালয় থেকে অনেক দূরে! এ বিজন মরুতে কোথায় পাবো আঙুর? ধরলাম, খুঁজতে খুঁজতে পেয়ে গেলাম। কিন্তু তারপর? কোথায় পাবো তার মূল্য? আমি নিজেই তো উপোস আছি– টানা দু’দিন? তা ছাড়া এখন তো আঙুরের মওসুমও না। কোথাও দুয়েক থোকা পাওয়া গেলেও ভীষণ চড়া মূল্যে তা বিকাবে। আমার মতো দু’দিন না-খাওয়া মানুষ কী করে জোগাড় করে আনবে সেই মৌসুম-ছাড়া ও বাজার-চড়া আঙুর? আমি যদি এখন এক দিরহামেরও মালিক হতাম, তাহলে প্রথমেই রুটি কিনে ক্ষুধার আগুনটাকে নেভানোর চেষ্টা করতাম। কিন্তু সেই দিরহামটিও তো আমার কাছে নেই!

আমি বৃদ্ধের আঙুর খাওয়ার ইচ্ছেকে সামনে নিয়ে নিশ্চল বসে রইলাম। কিছুক্ষণ এভাবে কেটে গেলে বৃদ্ধ আবার আমার দিকে তাকালো। আমি আবার চমকে উঠলাম। বৃদ্ধ বললো–
‘বাবা! পারবে তুমি আমায় একটু আঙুর খাওয়াতে!’

আহ! কী কাতর আবেদন! কী করি আমি এখন? বৃদ্ধের প্রতি মায়া ও দরদে হৃদয়ে আমার ঝড় বইতে লাগলো। সেই ঝড়ের মুখে দাঁড়িয়ে আমি ভাবলাম–

‘মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে-থাকা এ-বৃদ্ধ হয়তো বা জীবনের শেষ ইচ্ছে হিসাবেই আঙুর খেতে চাইছে। অবশ্যই আমি তাকে আঙুর এনে দেবো! যেখান থেকে পারি সেখান থেকেই এনে দেবো! আমার জীবনের বিনিময়ে হলেও এনে দেবো! দেবোই! কোনো দোকানে আঙুর না পেলে আমি আঙুর গাছের কাছে বসে বসে আল্লাহ্র কাছে

মুনাজাত করতে থাকবো!'
ঝড় উঠলো আমার মায়া ও দরদের ছোট্ট জগতে। আমি বৃদ্ধকে আশ্বস্ত করে বললাম–
'চাচা! একটু অপেক্ষা করুন! আমি আসছি, আঙুর নিয়ে আসছি! একটু পরই আপনি আঙুর খেতে পারবেন, ইনশাআল্লাহ!'

আমি লোকালয়ের দিকে ছুটে যেতে লাগলাম আঙুরের খোঁজে। কীভাবে আনবো এবং কী দিয়ে আনবো– সে চিন্তা মাথায় কাজ করছিলো না। শুধু ভাবছিলাম– আঙুর যদি বাজারে থেকে থাকে তাহলে আমি বৃদ্ধের কাছে আঙুর নিয়ে হাজির হবোই।
ওহ! কী সৌভাগ্য আমার! লোকালয়ের কাছে আসতেই এক আঙুর বিক্রেতার দেখা পেয়ে গেলাম। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম–
'ভাই, কী দরে দিচ্ছো?'
'এক দিরহাম।'

আমি কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম!
এখন কী করবো? লোকটাকে আঙুর মাপতে বলবো কি? কিন্তু মূল্য পরিশোধ করবো কী করে?
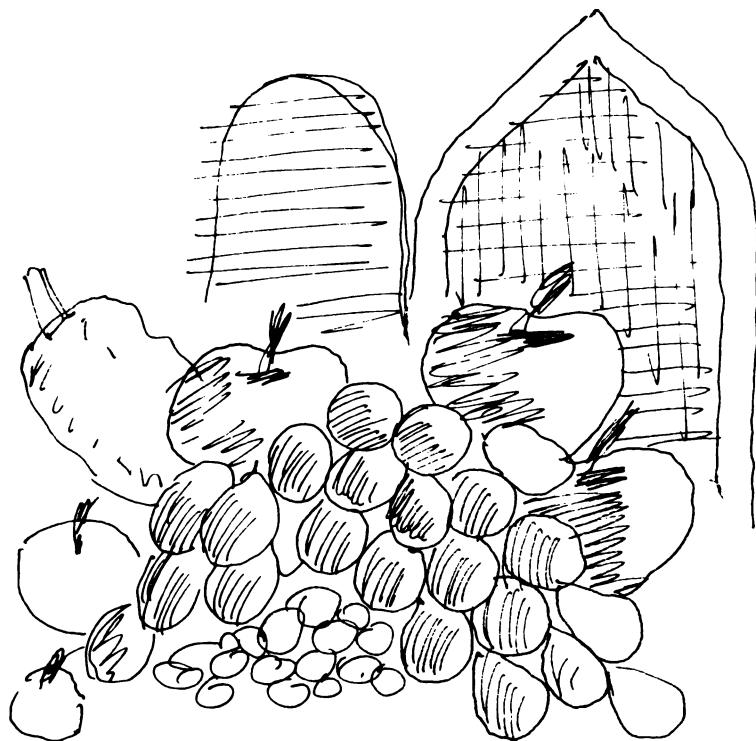
আমার গায়ে দামী একটা চাদর ছিলো। মায়া ত্যাগ করে বিক্রেতার দিকে চাদরটা এগিয়ে দিয়ে বললাম–

'এটি ছাড়া আমার কাছে আর কিছুই নেই। মৃত্যুর দুয়ারে দাঁড়িয়ে থাকা এক বৃদ্ধকে আঙুর খাওয়ানোর প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছি। তার অন্তিম ইচ্ছা– আঙুর খাওয়া! তুমি কি দয়া করে এ-চাদরটি এক দিরহামে কিনে আমাকে আঙুর দিতে পারো? তাহলে এক বৃদ্ধের অন্তিম আকাঙ্খা পূরণে সহযোগিতা হবে!'
লোকটি বললো–

‘এ-চাদরের মূল্য আধা দিরহামের বেশী হবে না। রাজি থাকলে নিতে পারো।’

লোকটার কথা শুনে আমার মেজায গরম হয়ে গেলো। কিন্তু দর কষাকষির সময় ছিলো না আমার। বললাম–
‘ঠিক আছে, তাই দাও।’

লোকটি আমাকে আঙুরের একটা ছড়া দিলো। আমি আর দেরী করলাম না। মায়া লাগতে পারে– এ জন্যে চাদরটার দিকেও

তাকালাম না। সোজা ছুটতে লাগলাম মরুর বুকের মসজিদটির দিকে। তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে মরুভূমি হয়ে আছে। আঙুরের ছড়াটা তো আমার হাতেই! তাকালামও তার দিকে! দুয়েকটা আঙুর ছিঁড়ে খেলে কী এমন কমবে? রসে টসটস করছিলো আঙুরের থোকাটা। খাবো? না! এ হয় না! ইচ্ছেটাকে দমন করলাম কঠোরভাবে। মৃত্যুপথযাত্রী এক অসহায় বৃদ্ধের এ-আঙুরে আমি হাত লাগাবো না। এ-থোকাটা তার, শুধুই তার। বিনিময় আশা করছি আমি আল্লাহ্‌র কাছে, শুধুই আল্লাহ্‌র কাছে। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে আর কি-ইবা চাওয়ার আছে আমার? অসুস্থ বৃদ্ধ কী বিনিময় দেবেন আমাকে? কী আছে তার কাছে? তার এমন কোনো খ্যাতিও তো নেই, যা আমি কাজে লাগিয়ে উপকৃত হতে পারি? তার শিয়রে অন্য কোনো মানুষও তো নেই, যে আমার এ-বদান্যতা দেখে বাহবা দেবে! তাহলে এ কি নয় শুধু আল্লাহ্‌র জন্যে?

আমি মনে স্বস্তি অনুভব করলাম। তৃপ্তি অনুভব করলাম। কিন্তু মনটা স্বস্তি ও তৃপ্তিতে ভরে উঠলেও হাত-পা আমার অবশ হয়ে আসছিলো। ক্ষুধা ও ক্লান্তির ভারে ভেঙে আসছিলো।

হঠাৎ মনে ভাবনা এলো–
লোকটিকে গিয়ে পাবো তো?
তার আঙুর খাওয়ার আশা মিটবে তো?
তারপর বিনিময় লাভের জন্যে আল্লাহ্‌র কাছে আমি কি দাবি নিয়ে হাত পাততে পারবো?

সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র! পৌঁছে দেখলাম– বৃদ্ধ চাটাইয়ে আগের মতোই শুয়ে আছেন। আমি ভীষণ পুলক ও উত্তেজনা অনুভব করলাম। নেক কাজে সফল হলে মানুষ যেটা অনুভব করে থাকে।

আমি কাছে এসে ডাকলাম–

'চাচা! এই যে আমি এসে পড়েছি! এই নিন মজার মজার আঙুর! আপনি হা করুন, আমি মুখে তুলে তুলে দিচ্ছি!'

খুশিতে বৃদ্ধের চোখ ঝলমলিয়ে উঠলো। উঠে বসার চেষ্টা করলেন। পারলেন না। আমি তাকে শুইয়ে দিলাম। তারপর থোকাটা থেকে আঙুর ছিঁড়ে ছিঁড়ে তার মুখে পুরতে লাগলাম। তিনি তৃপ্তিভরে চাবাতে লাগলেন। এভাবে সবগুলো আঙুরই তিনি শেষ করে ফেললেন।
আমি ভীষণ তৃপ্ত– না খেয়ে, শুধু তাকে খাইয়ে!
এ-তৃপ্তি– আল্লাহ্‌র পথের তৃপ্তি।
এ-তৃপ্তির কোনো তুলনা নেই।
এ-তৃপ্তির কোনো তুলনা চলে না, সব তুলনা অচল।
এ-তৃপ্তির বর্ণনাও দেয়া যায় না, সব বর্ণনা অপ্রতুল।
এ-তৃপ্তি শুধু উপলব্ধি করা যায়, শুধুই উপলব্ধি।

বৃদ্ধের চোখে-মুখে আঙুর খাওয়ার পর আমি যে স্বর্গীয় জ্যোতি দেখেছি, তা কখনো আমার চোখ থেকে সরে নি! আজো আমি সে জ্যোতি দেখতে পাই– একেবারে আমার চোখের সামনে।
এরপর বৃদ্ধ আমার দিকে তাকালেন কৃতজ্ঞতাপূর্ণ দৃষ্টিতে। বললেন বড়ো আবেগমথিত কণ্ঠে। চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে। সে দৃষ্টির সামনে, সে কণ্ঠের কাছে, সে অশ্রুর আমি আর স্থির থাকতে পারলাম না। ঝরঝর করে কেঁদে ফেললাম। তিনি আমাকে বললেন–

'বাবা! তুমি আমাকে খুশি করেছো, আল্লাহও তোমাকে খুশি করবেন!'

তারপর বৃদ্ধ মাথার দিকে ইশারা করে আমাকে বললেন–
'চাটাইয়ের মাথাটা একটু উপরে উঠাও তো!'
আমি উঠালাম। বৃদ্ধ বললেন–
'উপরের মাটিটা একটু সরাও তো!'

আমি সরাতে লাগলাম। হঠাৎ বেরিয়ে এলো একটা থলে। থলেটা দেখিয়ে বৃদ্ধ আমাকে বললেন–

'বাবা! মৃত্যু আমার খুব কাছে। মনে হয়, কিছুক্ষণ পরই মৃত্যুর ডাকে সাড়া দিতে হবে। তোমার কাছে আমার আরেকটি অনুরোধ– তুমি আমার মৃত্যুর পর কাফন-দাফনের ব্যবস্থাটুকু করে এ-থলেটা নিয়ে যেও!'

আমি আমার কানকে বিশ্বাস করতে পারলাম না। থলেটি হাতে নিয়ে খুললাম। ভিতরে তাকিয়ে দেখলাম– স্বর্ণমুদ্রায় ঠাসা!! এবার আমি আমার চোখকেও বিশ্বাস করতে পারলাম না!! আমি যা শুনলাম– তা কি বাস্তব? আমি যা দেখছি– তাও কি বাস্তব? বারবার দেখতে লাগলাম স্বর্ণমুদ্রাগুলো! উত্তেজনায় হাত দিয়ে স্পর্শ করছিলাম! আমি কি জেগে আছি না দেখছি কোনো সুখ-স্বপ্ন?!

আমার মনটা আনন্দে ভাসতে লাগলো। কিন্তু পরক্ষণেই আমার বিবেক আমাকে সতর্ক করে দিলো। 'এতো খুশি হওয়ার কী আছে? এর আসল মালিক তো আর তুমি নও!! এর মালিক বৃদ্ধ অথবা তার কোনো ওরারিশ, যে তোমার চেয়ে বেশী হকদার। সুতরাং তোমার এতো আপ্লুত হওয়ার কিছু নেই।'

আমি বৃদ্ধকে বললাম–
'আচ্ছা বলুন তো, এ-স্বর্ণমুদ্রাগুলো কার? আপনার?'
'হ্যাঁ আমার!'
'আপনার কোনো আত্মীয়স্বজন বা ওয়ারিশ নেই?'

এ-প্রশ্নের উত্তরে বৃদ্ধ অস্পষ্ট কণ্ঠে কী যেনো বলে যাচ্ছিলেন, আমি তা বুঝতে পারছিলাম না। আরো কান পেতে, আরো মনোযোগ দিয়ে শোনার চেষ্টা করলাম। হাঁ, এবার বোঝা যাচ্ছে। বৃদ্ধ বলছিলেন–

'পৃথিবীতে এক ভাই ছাড়া আমার আর কেউ নেই। ও আমার ছোট। মা-বাবার মৃত্যুর পর আমিই ছিলাম ওর মা-বাবা। ও তখন একেবারেই শিশু। কতো কষ্ট করে ওকে আমি বড় করেছি, মানুষ করেছি। ওর বিশ্রামের জন্যে নিজের বিশ্রাম ত্যাগ করেছি। ওর ঘুমের জন্যে আমি রাতের পর রাত না-ঘুমিয়ে ওর পাশে বসে

থেকেছি। ও বড় হয়ে যখন সবকিছু বুঝতে শিখলো, আমার ব্যবসায় লাগিয়ে দিলাম। আমার ব্যবসার অংশীদারিত্বও দিলাম। দুই ভাই এক সাথে ব্যবসা করতাম। বাণিজ্য সফরগুলোও আমাদের এক সাথেই হতো। কখনো যেতাম সিরিয়া। কখনো বা পারস্যে। সাথে নিয়ে যেতাম লাভজনক পণ্যদ্রব্য। ফিরার সময় সাথে করে নিয়ে আসতাম উপযুক্ত পণ্য। আমাদের বাজারে যে সব পণ্যের খুব চাহিদা ছিলো।

এভাবে আমরা দশ বছর এক সাথে ব্যবসা করি। একবার এমনই এক বাণিজ্য সফর শেষে আমরা ফিরে আসছিলাম। সেই সফরে আমাদের প্রচুর মুনাফা হয়েছিলো। আমরা পৃথক পৃথক থলেতে আমাদের লাভের টাকা রেখে দিয়েছিলাম। ওর থলেটি ছিলো আমার কাছে।

একরাতে কাফেলা ডাকাতের কবলে পড়লো। আমরা প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করলাম। কিন্তু পারলাম না। ওরা সংখ্যায় ছিলো অনেক বেশি এবং খুবই সংঘবদ্ধ। আমরা করুণভাবে পরাস্ত হলাম। ওরা লুটে নিয়ে গেলো আমাদের পণ্যসামগ্রী। কেউ হারালো মূলধন। কেউ হারালো টাকার থলে। আহত হলো অনেকে। নিহতও হলো অনেকে। আমি নিজেও গুরুতর আহত অবস্থায় বেহুঁশ হয়ে পড়ে রইলাম। আমাকে নিহত ভেবে ডাকাতরা আর কাছে আসে নি। অচেতন অবস্থায় কেটে গেলো রাত ও সকাল। দুপুরের ঘনঘনে সূর্যতাপে আমার চেতনা ফিরে এলো। তাকিয়ে দেখলাম– রক্ত! রক্তমাখা লাশ!! আঁতকে উঠলাম! তাহলে কি আমি একাই বেঁচে আছি?! আশ্পাশের বিজন মরু খা খা করছে। মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে টিলা। আমি ভীষণ ভয় পেয়ে গেলাম।

শোকে-দুঃখে পাথর হয়ে কিছুক্ষণ বসে রইলাম। দু' চোখ ছাপিয়ে নেমে এলো অশ্রুধারা। অনেকক্ষণ বসে বসে আমি অশ্রুপাত করলাম।

এ অশ্রু– বেদনামাখা অশ্রু! কেননা এ অশ্রু– প্রিয়হারা মানুষের অশ্রু! একটু পর উঠে দাঁড়ালাম। ছড়িয়ে থাকা লাশের ভিতরে ভাইটিকে খুঁজতে লাগলাম। কিন্তু পেলাম না, পেলামই না। চোখের পানিতে বুক ভেসে গেলো। কী ঘটতে পারে? হয়তো সে বন্দি হয়েছে। অথবা কোনো রকমে জানটা নিয়ে পালিয়ে গেছে। আমি সফরসঙ্গীদের লাশ সামনে নিয়ে অনেকক্ষণ বসে থাকলাম। তারপর তাদেরকে বিদায় জানালাম– চোখের পানি আর দীর্ঘশ্বাস দিয়ে। তারপর ধীরে ধীরে লোকালয়ের খোঁজে পা ফেললাম। বুকে তোলপাড় করছিলো একমাত্র ভাইকে হারানোর বেদনা।

বিধ্বস্ত শরীর চলতে চায় না। তবু জোর করে করে পা ফেলতে লাগলাম। অনেক পথ এভাবে হাঁটতে হাঁটতে এক কাফেলার দেখা পেলাম। তাদের কাছে গিয়ে হাজির হলাম আমার দেহ-আত্মার ক্ষত নিয়ে, আমার সীমাহীন অসহায়ত্বের আকুতি নিয়ে। আমার মুখের ভাষায় না হলেও আমার অবস্থার ভাষায় সবাই প্রভাবিত হলো এবং দরদ ও ভালোবাসা নিয়ে আমাকে কাছে টেনে নিলো। মুহূর্তেই তারা আমাকে আপন করে নিলো। যত্ন করে খাওয়ালো। ক্ষতস্থানগুলো পরিস্কার করে করে ওষুধ লাগিয়ে দিলো। সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত আমাকে তারা ছাড়লো না।

পূর্ণ সুস্থ হয়ে আমি তাদের কাছে বিদায় চাইলাম। তারা ভালোবাসা আর চোখের পানি দিয়ে আমাকে বিদায় জানালো। আমার 'নিখোঁজ' ভাইয়ের জন্যে সমবেদনা প্রকাশ করলো।

তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমি বেরিয়ে পড়লাম আমার 'নিখোঁজ' ভাইয়ের সন্ধানে। আল্লাহ্র হাজার শোকর, আমার এবং আমার ভাইয়ের থলে দু'টির উপর দস্যুদের চোখ পড়ে নি। পণ করলাম– ওকে খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত আমি ওর থলে স্পর্শ করবো না।

এরপর আমি ওর খোঁজে হন্য হয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। শহর থেকে শহরে। গ্রাম থেকে গ্রামে। এখান থেকে ওখানে। সেদিন দস্যুদের আক্রমণ থেকে যারা যারা জানে বেঁচে গিয়েছিলো তাদের প্রায় সবার কাছে গিয়েই আমি ওর খবর জিজ্ঞাসা করেছি। যাতায়াতে অনেক পয়সা ভাঙতে হচ্ছিলো। আমার থলেটা ধীরে ধীরে শূন্য হয়ে আসতে লাগলো। এদিকে ব্যবসা-বাণিজ্যও একেবারে বন্ধ হয়ে আছে।

কিন্তু এতো চেষ্টা ও মেহনতের পরও আমি তার কোনো সন্ধান পেলাম না। জানি না, এখন সে বেঁচে আছে না মরে গেছে! এদিকে আমি বাগদাদ এসেছি প্রায় দশদিন হতে চললো। আমার নিজের থলেতে টাকা পয়সা যা ছিলো, সব শেষ। ভাইয়ের থলেতে হাত দিতে মন সায় দিলো না। তাই এ ক'দিন একদম না খেয়েই এখানে পড়ে আছি। মৃত্যুর সাথে লড়াই করছি। আগে থেকেই আমি বেশ অসুস্থ ছিলাম। এখন অনাহারের নির্দয় প্রকোপে সে অসুখ বেড়ে বেড়ে আমার এ-অবস্থা।

এখানে অনেকেই এসেছে। কিন্তু কেউ আমার দিকে ভালো করে একটু তাকায়ও নি। আল্লাহ তোমাকে আজ আমার কাছে টেনে এনেছেন। একটু আগে আমি তোমাকে যে থলেটি দিয়েছি, তা আমার হারিয়ে যাওয়া ভাইয়ের থলে। নিয়ে যাও! কোনোদিন যদি

তার সাথে তোমার দেখা হয়, তাহলে ফিরিয়ে দিয়ো। নইলে তুমিই এর হকদার! মনে হয় না সে আর বেঁচে আছে! যে খোঁজা আমি খুঁজেছি, বেঁচে থাকলে পেয়ে যেতাম!'
মন্ত্রী বলেই চললেন–

'বৃদ্ধকে এ-অবস্থায় রেখে আমি চলে যেতে পারলাম না। তার দেখাশোনা ও সেবাযত্নের জন্যে থেকে গেলাম তার কাছে। হঠাৎ সন্ধ্যায় দেখলাম– তার চোখ দু'টি বন্ধ। ভাবলাম ঘুমিয়েছে বুঝি! আরেকটু ঘনিষ্ঠ হলাম। তার শ্বাস-নিঃশ্বাস জারি আছে কি না– বোঝার চেষ্টা করলাম। হাত দিয়ে স্পর্শ করলাম। হালকা নাড়া দিলাম! সাথে সাথে আমার মনটা হাহাকার করে উঠলো। বৃদ্ধ ঘুমিয়েছে বটে, কিন্তু এ-ঘুম আর কোনোদিন ভাঙবে না! এ-ঘুম– না-ভাঙা ঘুম! এ-ঘুম কখনোই ভাঙে না! এ-ঘুম থেকে কখনো মানুষ জাগে না! এ-ঘুম– 'না-জাগা' ঘুম!!

আমি তাকে গোসল করালাম। কাফন পরালাম। মসজিদের পাশেই অগভীর একটা কবর খনন করে দাফন করলাম। আমি ছিলাম চরম ক্ষুধার্ত ও দুর্বল। অতি কষ্টে এ-দায়িত্বটুকু পালন করে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম।

বৃদ্ধের জন্যে আমার মনটা হাহাকার করছিলো। ভেজা চোখে আমি তার কবরকে বিদায় জানালাম। শক্তিহীন দেহটা আর শোক-বিহ্বল মনটা নিয়ে হাঁটা ধরলাম শহরের দিকে। হাতে আমার স্বর্ণমুদ্রা ভর্তি সেই থলেটি।

একটু পরই আমি আঙুর বিক্রেতার কাছে এসে উপস্থিত হলাম। প্রধানত আমার মূল্যবান চাদরটির মায়া আর দ্বিতীয়ত তাজা আঙুরের লোভ আমাকে দ্বিতীয়বার এখানে আসতে বাধ্য করলো। এসেই বললাম–

'জলদি আঙুর দাও। রুটি দাও। অন্য কোনো খাবার থাকলে তাও দাও। আর শোনো! সকাল বেলা তোমাকে যে চাদরটা দিয়েছিলাম, তাও এখন ফেরত দাও!'

আমার কথা শুনে লোকটি এমনভাবে আমার দিকে তাকালো যেনো আমি একটা বদ্ধ পাগল। তার চোখের ভাষা যেনো বলছিলো– 'কী অবাক করা কাণ্ড! যে তুমি সকাল বেলা এসে পরনের চাদর বিক্রি করে আঙুর নিয়ে গেলে সেই তুমি বিকেলে এসে অমন দাপটের সাথে আমার কাছে এতোগুলো জিনিস চাইতে পারলে একসঙ্গে? তাও আবার চাদর ফিরিয়ে দেয়ার 'হুকুম জারি' করে?!'
আমি তার চোখের ভাষা পড়তে পারলাম। বললাম–

'এই মিয়াঁ! অমন করে আমার দিকে তাকাচ্ছো কেনো? আমি কি পাগল-টাগল নাকি? যা বললাম তাড়াতাড়ি দাও! আর এই নাও!

এখান থেকে মূল্যটা কেটে রাখো!' আমি একটা স্বর্ণমুদ্রা তার দিকে এগিয়ে দিলাম।

স্বর্ণমুদ্রা দেখে (তাও আবার 'সকাল বেলার ফকির'-এর কাছে!) সে হকচকিয়ে গেলো! বললো-
'কোথায় পেয়েছো এটা?'
'ঐ যে পরিত্যক্ত মসজিদটা, ওখানে!'

আমি মোটেই মিথ্যা বলি নি। ওখানেই তো আমি পেয়েছি! পিতৃতুল্য বৃদ্ধের কাছে পেয়েছি! আল্লাহ তার কবরকে নূরে রহমতে পূর্ণ করে দিন!

তারপর আমি যা যা চেয়েছিলাম, লোকটি দ্রুত তা আমার সামনে পেশ করলো। আমি তৃপ্তিভরে খেলাম। এমন তৃপ্তি জীবনে আর কোনোদিন অনুভব করেছি বলে মনে পড়ে না। এটা কি বৃদ্ধের নেক দু'আর বরকত?

শরীরে বেশ শক্তি অনুভব করলাম। সব মিলিয়ে মূল্য কেটে রাখা হলো মাত্র দেড় দিরহাম। ফেরত দিলো আমাকে আঠারো দিরহাম। দিরহামগুলো পাঞ্জাবীর পকেটে রেখে আমি শহরের দিকে পা বাড়ালাম। যেতে যেতে সামনে একটা নদী পড়লো। তীরে বসে নৌকার অপেক্ষা করতে লাগলাম। একটু পরই দেখলাম একটা নৌকা আমার দিকে ছুটে আসছে। মাঝিটি গলা ছেড়ে আমাকে তার নৌকায় উঠতে বলছিলো-

'জনাব! মেহেরবানী করে আমার নৌকায় উঠুন! মাত্র দু'পয়সা! আপনাকে ঠিক জায়গায় নামিয়ে দেবো।'

আমি মাঝির বিশুদ্ধ উচ্চরণে বিস্মিত হলাম। কে জানে, কোন্ বড় ঘরের ছেলে এসে মাঝি হয়েছে!

আমি তার আহ্বানে সাড়া দিলাম। তার নৌকাতে গিয়েই বসলাম। নৌকার পাটাতনে চমৎকার মাদুর পাতা। বসতে ভালোই লাগছিলো। মাঝিটি খুশি খুশি চেহারায় আমাকে নিয়ে নৌকা ভাসিয়ে দিলো।

বয়স তেমন না। উঠতি বয়সের যুবক। কিন্তু মুখাবয়বে লেপটে ছিলো– দুঃখ, বেদনা, দারিদ্র ও দুর্বলতার ছাপ। তাই যুবক বয়সেই তাকে বুড়ো বুড়ো লাগছিলো।

আমি গভীর করে মাঝির দিকে তাকালাম। জানতে চাইলাম–
'বাড়ি কোথায়?'
'আমার আসল বাড়ি 'বোসাফা'।'
'পরিবার পরিজন কোথায় থাকে?'

'ওরা আমার সাথেই থাকে। স্ত্রী ও সাত ছেলে-মেয়েকে নিয়ে আমি নৌকাতেই থাকি। এখানে আমার কোনো ঘর-বাড়ি নেই।'
'এতো বড় পরিবারের খরচ চলে এ-নৌকায়?'
'খুব কষ্টে! সারাদিন নৌকা বেয়ে কোনোদিন রুটির পয়সা আসে কোনোদিন আসে না! এভাবে কোনো রকমে চলে যাচ্ছে।'
'তোমার কি অন্য কোনো ভাই আছে?!'

আমি ভেবেছিলাম সাথে সাথেই সে উত্তর দেবে। 'হ্যাঁ' কিংবা 'না' বলবে। কিন্তু দেখলাম ও একটা দীর্ঘশ্বাস গোপন করলো। চেহারায়ও একটা বিরক্তি-চিহ্ন ফুটে উঠলো। কিছুক্ষণ পর সে বললো–
'হ্যাঁ, আমার এক ভাই ছিলো। আল্লাহ যেনো তার ভালো না করেন!'
আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম–
'কেনো?'
'কারণ, সেই আমাকে পথে বসিয়েছে!'
'সে কী কথা? একটু খুলে বলবে কি?'
মাঝি তখন বললো–

'আমার ভাইটি ছিলেন ভীষণ আল্লাহওয়ালা। আমাকে পড়ালেখা শিখিয়েছেন। ব্যবসা-বাণিজ্যও শিখিয়েছেন। এমন ভালো ও কল্যাণকামী ভাই আমি আর দেখি নি। বাবার মৃত্যুর পর তিনিই ছিলেন আমার বাবা। কিন্তু সেই ফেরেশতা-চরিত্রের ভাইটি আমার একবার পড়ে গেলো শয়তানের খপ্পড়ে। আমার সমস্ত ধন-সম্পদ নিয়ে তিনি হাওয়া হয়ে গেলেন। আমাকে মৃত্যুর মুখে দাঁড় করিয়ে তিনি পালিয়ে গেলেন। ঘটনাটা আপনাকে আরেকটু খুলে বলছি–
আমরা দু'ভাই এক বাণিজ্য সফর শেষে বাড়ি ফিরছিলাম। আমার ভাই 'পরহেযগারী' দেখিয়ে পথেই আমাদের লভ্যাংশ ভাগ করে ফেললেন। আমার ভাগটাও তিনি নিজের কাছেই রেখে দিলেন। আমাদের কাফেলায় তখন একদল চোরও কীভাবে যেনো এসে মিশে গিয়েছিলো। রাত যখন গভীর হলো, তখন পূর্ব-পরিকল্পনা অনুযায়ী তারা আমাদের উপর সংঘবদ্ধভাবে ঝাঁপিয়ে পড়লো। অনেকেই নিহত হলো। ডাকাতরা প্রায় সবার মালামাল লুট করে নিয়ে গেলো।

আশ্চর্য! আমার ভাইটিও তখন উধাও হয়ে গেলেন। আমি আহত হয়ে রক্তভেজা লাশের সাথে পড়েছিলাম অচেতন অবস্থায়। চেতনা ফিরে আসার পর লাশের ভিতর থেকে আমি উঠে দাঁড়ালাম। তখন আমার কাছে না ছিলো অর্থকড়ি না ছিলো কোনো বাহন। একেবারে নিঃস্ব, অসহায়। এমন কঠিন পরিস্থিতিতে কখনো আমাকে পড়তে হয় নি। আগুনঝরা সূর্যের তাপে আমার গা পুড়ে যাচ্ছিলো। আমি একদিকে হাঁটা ধরলাম। আশ্রয়ের সন্ধানে। খাবারের তালাশে। জীবন বাঁচানোর তাগিদে।

চলতে চলতে পেয়ে গেলাম এক কাফেলার দেখা। আমার দুরবস্থা

দেখে তারা আমার প্রতি সদয় হলো। আমাকে সাথে নিতে রাজি হলো। আমি তাদের সাথে শহর থেকে শহরে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। ভাইটির সন্ধানে উদ্বেগভরা দিন কাটাতে লাগলাম। কিন্তু তাকে পেলাম না, পেলামই না। এভাবে ঘুরতে ঘুরতে একদিন বাগদাদ এসে উপস্থিত হলাম। এখানে এক মাঝির বাড়িতে নৌকা চালানোর চাকরি পেলাম। সারাদিন নৌকা চালিয়ে এক দিরহাম দেড় দিরহাম পেয়ে যেতাম। এভাবে কিছুদিন কাটার পর একদিন মাঝি আমাকে আরো কাছে টেনে নিলেন। শুধু মাঝি হিসাবেই নয়; সম্ভবত মানুষ হিসাবেও আমাকে তার খুব ভালো লেগেছিলো। নিজের মেয়ের সাথে সে আমার বিবাহের বন্দোবস্ত করলো। একদিন খুব সাদাসিধেভাবে আমাদের বিবাহ হয়ে গেলো। সেই থেকেই আমি মাঝির পরিবারের সদস্য হয়ে গেলাম। মাঝি মানে আমার শ্বশুর আমাকে এ-নৌকাটা উপহার দিয়েছেন। এখন এ-নৌকাই আমার আয়ের একমাত্র উৎস।'

মন্ত্রী বলেই চললেন–

'মাঝিবেশী যুবকটির দুঃখ-কাহিনী শুনে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হলো যে, এ-ই বৃদ্ধের হারানো ভাই হবে। চেহারায়ও সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

আমি অনুভব করলাম, একটা প্রচণ্ড ঝড় যেনো ধীরে ধীরে আমার মনের আকাশে ধেয়ে আসছে। আমার আবেগ-অনুভূতি জুড়ে সে ঝড়ের দমকা হাওয়া বইতে লাগলো। সবকিছু কি দুমড়ে-মুচড়ে যাবে? হায়! এক থলে স্বর্ণমুদ্রা পাওয়ার আনন্দ কি তাহলে দীর্ঘ হবে না?

কী অদ্ভুত! আমি এক ঘন্টা যেতে না যেতেই আসল মালিকের দেখা

পেয়ে গেলাম! অথচ তার ভাই এক যুগ খুঁজেও তার সন্ধান পেলো না! কী করবো এখন আমি? ফিরিয়ে দেবো মালিকের থলে মালিকের কাছে? ফিরে যাবো কি আমি শূন্য হাতে? ফিরে যাবো কি আবার ক্ষুধা-তৃষ্ণা-বঞ্চনার আঁধারঢাকা পৃথিবীতে? মাত্র এক ঘন্টা স্বর্ণমুদ্রার থলেটা বহন করার পর? মাত্র এক ঘন্টার জন্যে এ-অদ্ভুত বাদশাহির আজব সিংহাসনে আরোহন করার পর?

এ-সব প্রশ্নের উত্তরে আমার মন এবং আমার বিবেকের মাঝে একটা তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলো। মন বললো–

'মাঝি তো তার জীবন নিয়ে বেশ সুখেই আছে! এ-জীবনেই তো এখন সে অভ্যস্ত! ইচ্ছায় বলো আর অনিচ্ছায় বলো– এখন এ-জীবনকেই ও মেনে নিয়েছে! সুতরাং তুমি যদি ওকে থলেটা সমর্পণ করো, তাহলে তুমি ওর উপকার না করে বরং ক্ষতিই করবে বেশী। কেননা এ-স্বর্ণমুদ্রা হঠাৎ ওর জীবনধারা বদলে দেবে। বর্তমানকে লণ্ডভণ্ড করে দেবে। হঠাৎ করে ও এতো সম্পদ হাতে পেয়ে নিশ্চিত চরম বল্গাহারা বিলাসী ও উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠবে। তাই ভুলেও তুমি ওর কাছে থলের রহস্য ফাঁস করে দিয়ো না!'

মনের এমন কুপ্রস্তাবে আমি যখন দিশেহারা তখনই এলো বিবেকের দিক-নির্দেশনা। বিবেক বললো–

'না! এ কক্‌খনো হতে পারে না! তুমি হারাম মাল খেতে পারো না! এ কি নয় হারাম মাল? থলের মালিক বসে আছে তোমার সামনে। তাকে থলে না দিয়ে কোন্ অধিকারে তুমি তা নিয়ে যাবে? তোমার ইলম-কালাম ও বিদ্যা-বুদ্ধি কি তাহলে বৃথা যাবে? শোনো, এটা তোমার জন্যে তো বটেই, সবার জন্যেই বিষ। জেনেশুনে তুমি বিষ পান করতে পারো না! তার থলে তাকে ফিরিয়ে দাও– এক্ষুণি!

কেনো বিশ্বাস করো না– আল্লাহ্ এর বিনিময়ে তোমাকে আরো অনেক বেশী দিতে পারেন?!'

আবার হাজির হলো আমার দুষ্ট মন। এসে বললো–
'তুমি যদি ওর জন্যে কিছু করতেই চাও, তাহলে ওকে দশটি আশরাফী দিয়ে যেতে পারো। এতেই সে সীমাহীন খুশি হবে। আনন্দে লাফাতে থাকবে। আকাশের চাঁদ হাতে পেলেও ও এমন খুশি হবে না। আর বাকিটা তুমি নিজের জন্যেই রেখে দাও। তা ব্যবসায় খাটাও। লাভবান হও। একটু আরাম-আয়েশে জীবনটা কাটাও। মাঝির দশ দিনার যখন শেষ হয়ে যাবে, তখন আবার এসে ওকে তুমি আরো দশটি দিনার দিয়ে যেয়ো।'
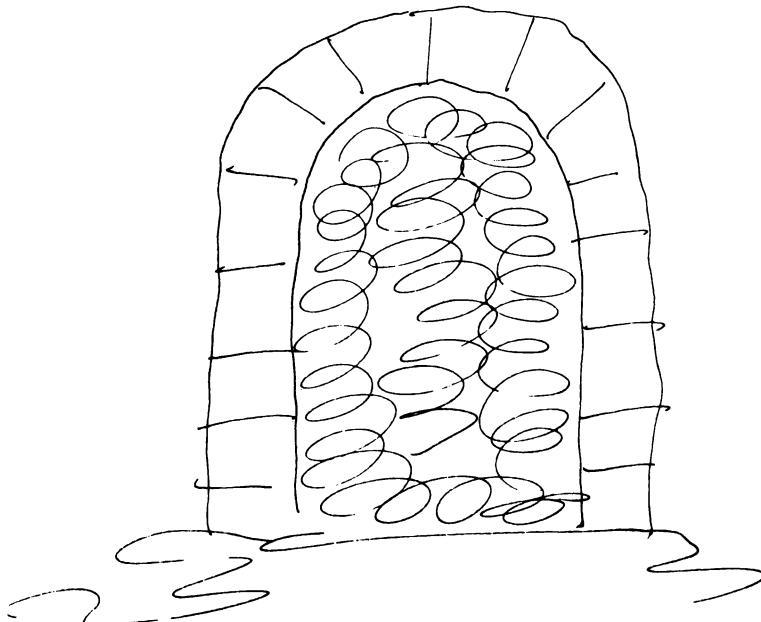
বিবেক এসে দাঁড়ালো আবার। চোখ রাঙিয়ে আমাকে বললো–
'ছি! কী ভাবছো তুমি? এতো নীচে নামতে পারো না তুমি! তুমি না ইলমে ওহী'র ছাত্র! মনে পড়ছে না তোমার– ওর বড় ভাইয়ের কথা? ভুলে গেলে এতো তাড়াতাড়ি? শুনো নি তার মুখে– কীভাবে ও ভাইয়ের থলেটিকে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অতি যত্নের সাথে আগলে আগলে রেখেছে? অনাহারে অনাহারে এবং ক্ষুধায় ক্ষুধায় ও শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছে, তবুও ও ভাইয়ের থলে স্পর্শ করে নি। জীবন সায়াহ্নে ওর আঙুর খেতে ইচ্ছে হয়েছে। তবুও ভাইয়ের থলেতে হাত দেয় নি! আর তুমি! এ কী ভাবছো তুমি? এমন ভাইকে সামনে পেয়ে তার থলে তাকে না দিয়ে নিজে নিয়ে যাবে– এতো তোমার জন্যে মোটেই শোভনীয় ও গ্রহণীয় নয়! তার ভাই কি তোমাকে বলে দেয় নি– 'আমার ভাইয়ের দেখা পেলে ওর হাতে এটা তুলে দিও'! তাহলে কীভাবে তুমি থলেটি নিয়ে যেতে পারো? তার অসহায়, দরিদ্র ও মুখাপেক্ষী ভাইটির বেদনাক্লিষ্ট ও

দারিদ্রপীড়িত চেহারা দেখেও তোমার একটু মায়া হচ্ছে না! এতোটা পাষাণ তো তোমার হওয়ার কথা না!!'

আমি বুঝতে পারছি না কোন্ পথে যাবো আমি। কার ডাকে সাড়া দেবো আমি। ভাবছিলাম– নফসে আম্মারাহ তো বিবেকের উপর বিজয় লাভ করতে পারে না! নফসে আম্মারাহ- এর ডাক, সে তো শয়তানের ডাক। আর বিবেকের ডাক– কল্যাণের ডাক। এ-ডাকেই আমার সাড়া দেয়া উচিত।

আল্লাহ আমাকে সাহায্য করলেন। আমার দুষ্ট মনের উপর বিজয় লাভ করলো আমার বিবেক। আমি দারুণ প্রশান্তি অনুভব করলাম। আমি আনন্দ-প্লাবিত কণ্ঠে বলে উঠলাম–

'আমার মাঝি ভাই! কোঁচড় খোলো!

মাঝি আমার দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে আমার নির্দেশ পালন করলো। আমি তার কোঁচড়ে হঠাৎ করে স্বর্ণমুদ্রার থলেটা ঢেলে দিলাম! সে এক সঙ্গে এতো স্বর্ণমুদ্রা তাও আবার তার কোঁচড়ে ঢেলে দেয়ায় ভয়ে বিস্ময়ে একেবারে পাগলের মতো চীৎকার করে উঠলো–

'এ কী?!'

আমি হাসিমুখে বললাম–

'কেনো? এ স্বর্ণমুদ্রা! আর দেখো নি বুঝি! অমন করে লাফিয়ে উঠলে যে!'

'কিন্তু জনাব! আমার সাথে এ 'পরিহাস' কেনো?'

'পরিহাস নয়, ইনসাফ!'

'ইনসাফ! মানে?!'

'দেখো তো এ-থলেটি চেনো কিনা!'

মাঝি বিস্ময়ভরা চোখে আমার দিকে তাকালো। তারপর থলেটি নিয়ে খুটে খুটে দেখতে লাগলো। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে রইলো– অবাক দৃষ্টিতে! আমি তার চোখের ভাষা বুঝলাম। মাঝি ঠিকই তার থলেটি চিনতে পেরেছে। কিন্তু 'আমার!' বলতে সাহস সঞ্চয় করতে পারছে না। অগত্যা আমিই বললাম–

'এই থলেটাই কি তোমার সেই হারিয়ে যাওয়া থলে?'

এবার মাঝির মুখে কথা ফুটলো। মুখে হাসি ফুটলো। এমন হাসি প্রস্ফুটিত গোলাপের মাঝেই কেবল দেখা যায়! পাহাড়ি ঝরনার কুলুকুলু শব্দেই কেবল শোনা যায়! মাঝি তারপর বললো–

'হ্যাঁ, এটি তো সে রকমই দেখতে! কিন্তু ....'

আমি তখন তাকে আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা খুলে বললাম। সে সাথে সাথে সেজদায় লুটিয়ে পড়লো! তার খুশি ও কৃতজ্ঞতার জোয়ারে আমার হৃদয়ও সুখ-প্লাবিত হলো! আজ এক সঙ্গে বড় ভাই এবং ছোট ভাইকে খুশি করতে পেরে .. তাদের মুখে ও মনে হাসি ফোটাতে পেরে নিজেকে আমার বড়ো ধন্য মনে হলো।

মাঝি তার বড় ভাইয়ের প্রতি এতোদিন খারাপ ধারণা পোষণ করার কারণে বড়ো অনুতপ্ত হলো। আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা চাইলো এবং অগ্রজের জন্যে রহমত ও মাগফেরাত কামনা করলো। তারপর সে একটা কাপড় বিছিয়ে স্বর্ণমুদ্রাগুলোকে দু'ভাগে ভাগ করতে লাগলো। আমি তখন বললাম–
'প্রিয় মাঝি! তুমি কী করতে যাচ্ছো?'

'স্বর্ণমুদ্রাগুলো ভাগ করছি! অর্ধেক আমার আর অর্ধেক আপনার!'
মাঝির মুখের হাসিটি ছিলো তখন স্নিগ্ধ ও অনাবিল! আমি বললাম–
'অসম্ভব! আমি ভালো কাজের খারাপ বদলা নিতে চাই না! বিনিময় আশা করি আমি শুধু আল্লাহ্‌র কাছে!'

আমি কঠোরভাবে তাকে 'না' বলে দিলাম। আমার যে আঠারোটি ভাংতি দিরহাম ছিলো, তাও তার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললাম–
'এই নাও! এ গুলোও তোমার! একটা স্বর্ণমুদ্রা প্রয়োজনে আমি একটু ভেঙে ফেলেছিলাম। এ জন্যে ক্ষমাপ্রার্থী!'

কিন্তু মাঝি আমার কোনো কথাই শুনতে চাইলো না। 'থলে থেকে কিছু-না-কিছু নিতেই হবে' বলে সে ভীষণ পীড়াপীড়ি শুরু করে দিলো। তাকে থামানোর জন্যে আমি আবার কড়া ভাষায় শপথ করে

বললাম–
'আল্লাহ্র কসম! আমি এখান থেকে একটি দিরহামও নেবো না! তোমার মাল তোমার জন্যে মুবারক হোক!!'

তারপর আমি তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আবার বেরিয়ে পড়লাম অজানা গন্তব্যে। অচেনা পথে। উদ্দেশ্যহীনভাবে। মনে হলো, আমি যেনো মধুময় এক স্বপ্নে এতোক্ষণ বিভোর ছিলাম। হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে গেছে। স্বপ্ন টুটে গেছে। এখন আমার চোখে-মুখে লেগে আছে শুধু সে স্বপ্নের আবেশ!

এদিকে আমার দুষ্ট মন আবার জেগে উঠলো। আমাকে 'শাসনের' ভাষায় বললো–
'বড়ো অদ্ভুত মানুষ তুমি! হালাল উপায়ে অর্ধেক স্বর্ণমুদ্রা হাতে পেয়েও কেনো নিতে রাজি হলে না? এখন কী অবস্থা হবে তোমার? আবার কি ফিরে যাবে তুমি ক্ষুধা-দারিদ্র-বঞ্চনার কালো পৃথিবীতে? অভাবের দুঃসহ অপমানকর জীবনে?'

কিন্তু ইতিমধ্যেই আমি দুষ্ট মনের কবল থেকে মুক্তি লাভ করতে পেরেছিলাম। তাই দুষ্ট মনের মিষ্ট কথায় আমি মোটেই প্ররোচিত হলাম না।

আমি ছিলাম ভীষণ তৃপ্ত। শান্ত প্রশান্ত। বেশ ফুরফুরে মেজাযেই আমি হাঁটছিলাম নির্ভার মন নিয়ে। হঠাৎ দেখি; আমি পৌঁছে গেছি বাগদাদ নগরীর এক মন্ত্রণালয়ের সামনে! কীভাবে যে এখানে চলে এলাম– কিছুই বুঝতে পারলাম না। কিছুক্ষণ থমকে দাঁড়িয়ে ঢুকে পড়লাম ভিতরে। যদি আজ একটা চাকরি মিলে যায়! যেতেও তো পারে!

ভিতরে গিয়ে জানতে চাইলাম–
'কোনো পদ শূন্য আছে?'
এ প্রশ্নের উত্তর কী– আমার জানা! অর্থাৎ 'না'! তাই আজো প্রশ্ন করে বেরিয়ে আসার জন্যে ঘুরতে যাচ্ছিলাম। তখনোই শুনতে পেলাম 'হ্যাঁ'!
আশ্চর্য! আজ কি তাহলে ইতিহাস মোড় নেবে অন্য দিকে?
নেবেই তো!

আজ যে আমার চিরশোনা 'না' হয়ে গেছে একদম অচেনা 'হ্যাঁ'!
এতোদিনের 'না' র ভিড়ে হঠাৎ এই 'হ্যাঁ' শুনে আমি আনন্দিত হতেও ভুলে গেলাম। আজকের বিস্ময়কর ঘটনাবহুল দিনটির স্মৃতির ভিতরে আমি হারিয়ে গেলাম। অনেকক্ষণ আচ্ছন্ন হয়ে রইলাম। আচ্ছন্ন হয়ে থাকতে হলো। মানুষের সামনে যখন অনেক সুখ-স্মৃতি এক সাথে জমা হয়ে যায়, তখন মানুষ আত্মার নিবিড়ে বড়ো সুখ অনুভব করে। আমি ভীষণ সুখ অনুভব করলাম।
সত্যি কি আমি আজ 'হ্যাঁ' শুনলাম?
অসংখ্যবার 'না' শোনার পর?

আল্লাহ্‌র দরবারে আমি অযুত-নিযুত কৃতজ্ঞতা পেশ করলাম। আল্লাহ তাঁর বান্দার প্রতি কতো মেহেরবান! তবু কেনো মানুষ এক দু'দিন না খেলে কিংবা সঙ্কটের মুখোমুখি হলে একেবারে ভেঙে পড়ে? ধৈর্য ধরতে কেনো সে সাহস পায় না? অথচ ধৈর্যের ফলাফল কতো চমৎকার, কতো মধুর! যেনো পাখ-পাখালির কলগান! কিংবা হাজার দিবস-রজনী কাটিয়ে একান্ত প্রিয়জনের সাথে দেখা হওয়ার পরের আলিঙ্গনযুক্ত মৃদু হাসি এবং চোখ থেকে ছেড়ে দেয়া বিন্দু বিন্দু শিশিরকণা!

প্রথমে আমাকে একটি ছোট্ট দায়িত্ব দেয়া হলো। কিছুদিন যেতে না যেতেই ডাক পেলাম মন্ত্রীত্বের! সাড়া দিলাম। সাথে সাথে ভাবলাম– নিঃসন্দেহে এটা আমানতদারীর বরকত! আল্লাহ্‌র প্রতি অবিচল আস্থা ও বিশ্বাসের পুরস্কার। এক থোকা আঙুরের বিনিময়! বৃদ্ধের দু'আ কি বৃথা যেতে পারে?'

বন্ধু! তোমরা কি কখনো শুনেছো একথোকা আঙুরের বিনিময়ে মন্ত্রীত্ব লাভের এমন চমৎকার কাহিনী?

ইতিহাসের চোখে ইবনে হোবায়রা

নাম– ইয়াহইয়া ইবনে হোবায়রা ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হোবায়রা আয যুহানী আশ শায়বানী। আব্বাসীয় যুগের শীর্ষস্থানীয় মন্ত্রী। ৪৯৭ হিজরীতে ইরাকের দোফাইলে তাঁর জন্ম। শৈশবেই তাঁর মনে জেগে উঠে ইলম হাসিলের দুর্বার পিপাসা। পাড়ি জমান বাগদাদে। সেখানে হাসিল করেন কুরআন-হাদীসে– গভীর জ্ঞান। ভাষা ও সাহিত্যে– ঈর্ষণীয় পাণ্ডিত্য।

আব্বাসীয় খলীফা 'মুকতাফা লি আমরিল্লাহ' তাঁকে চাকরিতে নিয়োগ দান করেন। দক্ষতা ও যোগ্যতা তাঁকে টেনে নিয়ে যায় অনেক উপরে। লাভ করেন তিনি রাজ উপাধী– 'আইনুদ্দীন'– দ্বীনের সাহায্যকারী।

মন্ত্রী হিসাবে তিনি ছিলেন পূর্ণ সফল। তাই খলীফার ওফাতের পর পরবর্তী খলীফা 'মুস্তাঞ্জিদ' এসেও তাকে স্বপদে বহাল রাখেন। এমন কি ৫৬০ হিজরীতে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি মন্ত্রীত্বের দায়িত্ব পালন করে যান।

মন্ত্রীত্ব লাভের কারণে তাঁর স্বভাবসুলভ ইলম ও জ্ঞান চর্চায় মোটেই ভাটা পড়ে নি। তখনো তিনি নিয়মিত মসজিদে ইলমের হালকায় দরস দিতেন, ছাত্র পড়াতেন। তাঁর মজলিসে এসে জড়ো হতেন নানা বিষয়ের পণ্ডিত ব্যক্তিগণ। তিনি আলেম-উলামা ও জ্ঞানী-গুণীদের ভীষণ কদর ও সম্মান করতেন। সময়ের বড়ো গুরুত্ব ছিলো তাঁর কাছে। কখন কী করবেন– তার একটা নিখুঁত ও সুসংহত পরিকল্পনা থাকতো তাঁর।

তিনি শাফেয়ী মাযহাবের ইলমে ফিক্‌হে সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁর

রচিত অন্যতম কিতাব হলো– 'আল– ইফসাহ ফি মা'আনিস সিহাহ'।

তিনি ইবনুস সাকিতের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'ইসলাহুল মানতিক'-এর সংক্ষিপ্ত একটি সংস্করণও রচনা করেন।

বলতে পারো, অতীতের কোন্ স্মৃতিটা মানুষকে সবচে' বেশি হাতছানি দিয়ে ডাকে, ডেকেই চলে অবিরত? জানি না, উত্তরে তুমি কী বলবে। তবে আমার মতে- সে হলো দাদী'র গল্পের আসর! আহা! কী মধুময় সেই স্মৃতি!! শৈশবকালে দাদী'র কাছে গল্প শোনার সেই গাল-ফোলানো ও কপাল-কুঁচকানো বায়নার কথা- কে ভুলতে পারে?..

শিশু হয় কিশোর, তারপর পরিণত যুবক। তখনও সে ভুলতে পারে না চাঁদনি রাতের মায়াবী জোৎস্নায় দাদী'র গল্পের আসরের সেই স্মৃতি। বয়স বাড়ার সাথে সাথে বাড়তে থাকে গল্পের প্রতি তার এই ঝোঁক ও আকর্ষণ। তার কেবলই ছুটে যেতে ইচ্ছে করে- সেই হারানো শৈশবে, মাদুরপাতা উঠানে, দাদী'র কাছে, চাঁদনি রাতের সেই গল্পের আসরে!

পাঠক! আমার বড়ো কষ্ট লাগে যখন গল্পের প্রতি শিশু-কিশোরদের এই ঝোঁক ও আকর্ষণকে আমরা কাজে লাগাতে ব্যর্থ হই। আর আমাদের ব্যর্থতায় দুশমনরা আমাদের গল্পপ্রিয় শিশু-কিশোরদের মাঝে ছড়িয়ে দেয়-গল্প নামের বিষ! আমাদের এই গাফিলতির জন্যে আল্লাহ কি আমাদেরকে ক্ষমা করবেন?

হ্যাঁ পাঠক! এই দায়বোধ থেকেই আমি প্রিয় শিশু-কিশোর বন্ধুদের জন্যে লিখেছি এই গল্প সিরিজ— ইতিহাসের সত্য কাহিনী অবলম্বনে। ইতিহাসকে অবিকৃত ও অক্ষুণ্ন রেখে শুধু গল্পের জামাটা পরিয়ে দিয়েছি ইতিহাসের গায়ে।

-আলী তানতাভী

ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলা বাজার, ঢাকা